টিয়ারশেলের আঘাতে নয়, স্ট্রোকে মৃত্যু সাংবাদিক রফিকের

পুলিশের টিয়ারশেলের আঘাতে নয়, স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক রফিক ভূঁইয়ার। এতথ্য জানিয়েছে তার কন্যা উর্মি ভূঁইয়া বলেন, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে (স্ট্রোক) মারা গেছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রফিক।

একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জবাবে উর্মি বলেন, ‘রিকশা করে যাওয়ার পথে আমার বাবা হঠাৎ স্ট্রোক করে রিকশা থেকে পড়ে যান। এরপর তার ব্রেইন ডেড হয়ে যায়, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। স্ট্রোক করার কারণে ব্যালান্স রাখতে না পেরে রিকশা থেকে পড়ে যান তিনি। আর তখন মাথার পিছনে ব্যথা পাওয়া ইন্টার্নাল ব্লিডিং হয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে টিয়ারশেলে মৃত্যু নিয়ে যেসব তথ্য প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আপত্তি তুলে ঊর্মি বলেন, ‘এধরনের খবর একেবারেই মিথ্যা। যদি টিয়ারশেলের আঘাতে আমার বাবা মারা যেতেন, তাহলে আমরাই জিডি করতাম বা অভিযোগ করতাম। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা এগুলো করিনি। আমরা কিছু না বললেও কিছু মানুষ এই ঘটনায় নানান রং মিশিয়ে বিভিন্নভাবে প্রচার করছে।’

উর্মি বলেন, ‘মানুষ আসলে বিভিন্ন রকম রং দিচ্ছে। আমার বাবা একজন একজন সহজ সরল ব্যক্তি, উনাকে নিয়ে যদি এটা করা খুবই দুঃখজনক। আমার বাবা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কোনো সুযোগ নেননি। এখন তিনি বলতেন- কেউ মায়ের জন্য কিছু করলে সুবিধা নেয় নাকি? দেশের জন্য যুদ্ধ করছেন, সুযোগ-সুবিধার জন্য নয়।’

এখন তাকে নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী দল টানাটানি করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এই মানুষটাকে নিয়ে যারা এধরনের মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে তাদেরকে থামতে বলেন সাংবাদিক রফিক ভূঁইয়ার মেয়ে।

শনিবার প্রেসক্লাবে যাওয়ার পথে সেগুনবাগিচায় রিকশা থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পান রফিক ভূঁইয়া। পরে তাকে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে সেখান থেকে আগারগাঁওয়ের

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় তিনি মারা যান।

রফিক ভূঁইয়া ১৯৫১ সালের ১০ জানুয়ারি ফেনীর দাগনভূঞায় জন্মগ্রহণ করেন। নিহত রফিক ভূঁইয়া জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাপ্তাহিক নতুন কাগজ–এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি চার ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন।

রাজনীতিক কোন সংলাপই সফলতার মুখ দেখেনি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসছে রাজনীতির মাঠে ততোই ‘সংলাপ’ সামনে চলে আসছে। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসেবে সংলাপকে গুরুত্ব দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোন সংলাপই কার্যকর কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আবারও আলোচনায় আসছে সংলাপের বিষয়টি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ, খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করে সংলাপে বসতে রাজি বিএনপি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শর্তযুক্ত কোন সংলাপে অংশগ্রহণ করবেনা দলটি। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসও শর্তহীনভাবে রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপে বসে সংকট নিরসন করবে বলে প্রত্যশা করেছেন। কিন্তু বাস্তবায়তা কী? কোনো সংলাপ কী সফলতার মুখ দেখেছিল?

জিয়াউর রহমানের সংলাপ
স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর যখন টালমাটাল রাজনীতির পরিবেশ,তখন নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে বসেন জিয়াউর রহমান। নিজের ক্ষমতার আসনকে পাকাপোক্ত করতে এবং রাজনৈতিক পরিবেশ নিজের অনুকূলে আনতে চতুর জিয়া তার বিশেষ সহকারী বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে দিয়ে ১৯৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ডেকে একটি সংলাপের আয়োজন করান। আওয়ামী

লীগসহ প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক দল সে সংলাপকে প্রত্যাখান করেছিল ।

এরশাদের যত সংলাপ
১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল বঙ্গভবনে সাত দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সাত দলের পক্ষ থেকে ৩০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয় এরশাদের কাছে। এরশাদ দাবি না মানলে সাত দলের নেতারা সংলাপ কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে আসেন। ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গভবনে জামায়াতের সঙ্গে সংলাপ করেন এরশাদ। ১১ এপ্রিল এরশাদ সংলাপ করেন ১৫ দলের নেতাদের সঙ্গে। সংলাপ ফলপ্রসূ না হলে ১৪ই এপ্রিল দ্বিতীয় দফা বৈঠক করেন ১৫ দলের নেতাদের সঙ্গে। আবার ১২ এপ্রিল এরশাদ বঙ্গভবনে বসে বৈঠক করেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে। একই বছর ২৮ এপ্রিল আবারও বঙ্গভবনে এরশাদের সঙ্গে সংলাপ হয় ১০ দলের। কিন্তু কোনো সংলাপ ফলপ্রসু হয়নি।

১৯৮৭ সালে সব বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অব্যাহত আন্দোলনে কোনঠাসা এরশাদ সংলাপের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি। রাজনৈতিক নেতারা প্রত্যাখ্যান করে সে আহ্বান। ওই বছরের ২৮ অক্টোবর এরশাদবিরোধী আন্দোলনের দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিলো। একই বছরের ২৮ নভেম্বর স্বৈরশাসক এরশাদ আবারও সংলাপের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি। কিন্তু কোনো দলের কাছ থেকেই তেমন সাড়া মেলেনি।

নব্বই পরবর্তী সংলাপ
নব্বই পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যায়, নির্বাচন এগিয়ে এলেই সামনে আসে সংলাপ প্রসঙ্গ। এসব সংলাপ কখনও হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, কখনও নেতাদের মধ্যে। কখনো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদেরও দেখা গেছে সংলাপের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।

১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। তাদের ক্ষমতার শেষদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে নামে প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট সরকারি ও বিরোধী দলের দুই উপনেতার বৈঠক হয়। একই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর সে সময়ের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের।

উদ্যোগ নেয়া হয় দুই প্রধান নেত্রীর বৈঠকের। কমনওয়েলথ মহাসচিব এনিয়াওকুর এমেকা ওই বছরের ১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এসে দেখা করেন দুই নেত্রীর সঙ্গে। এমেকা পরে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান স্যার

স্টিফেন নিনিয়ানকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সংলাপ তত্ত্বাবধানে তার বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি সফল হননি।

১৯৯৫ সালে আবার সংলাপের প্রস্তাব আসে সে সময়ের বিরোধীদল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তখনকার সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তবে সংলাপ ব্যর্থ হলেও ১৯৯৬ সালে একতরফা নির্বাচন করেও টিকতে পারেনি বিএনপি। আওয়ামী লীগসহ অন্য বিরোধীদলগুলোর আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় বিএনপি।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় সংলাপের আয়োজন হয়েছিল। ২০০১ সালেও নির্বাচনের আগে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে। সে সময় মধ্যস্থতার জন্য এসেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। তিনিও সংলাপ করেছিলেন দুই পক্ষের সঙ্গে। তার সে প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি।

২০০৬ সালের অক্টোবরে সে সময়ের সরকারি দল বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং বিরোধীদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল দফায় দফায় বৈঠক করেন। তিন সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক সংলাপে বিএনপি মহাসচিবের কাছে ২৯ দফা প্রস্তাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। ছয় দফা বৈঠক করেও তারা কোনো সমাধানে আসতে পারেননি।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২০১৩ সালের শেষ দিকে ঢাকায় আসেন জাতিসংঘ মহাসচিরের বিশেষদূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো। ছয়দিন ঢাকায় অবস্থান করে ১০ ও ১১ ডিসেম্বর বৈঠক করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে। তৃতীয় বৈঠক হয় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি নিল ওয়াকারের উপস্থিতিতে। কোনো বৈঠকই সফল হয়নি। এর আগে ওই বছরের ২৬ অক্টোবর টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন করেন সে সময়ের বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে সংলাপ
২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও আনুষ্ঠানিক সংলাপ হয় দুই রাজনৈতিক জোটের মধ্যে। ২০১৮ সালের পয়লা নভেম্বর গণভবনে অনুষ্ঠিত সে সংলাপে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফন্ট্রের প্রধান নেতা ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম

আলমগীরসহ বেশ কয়েকজন নেতা। আর আওয়ামী জোটের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪ দলের নেতারা।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে সংলাপ ইস্যু
যদিও সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তিনি বলেন, সংলাপ হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। আমরা বলেছি, আমরা সবসময় সংলাপকে স্বাগত জানাই। সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে আমরাও মনে করি। সংবিধান আমাদের যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। সংবিধান আমাদের যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ দপ্তরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

যদিও বিএনপি শুরু থেকেই ‘রাজপথেই ফয়সালা হবে’ আর আওয়ামী লীগ ‘বিএনপিকে কোন ছাড় নয়’ নীতি নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আলোচনা বা সংলাপ তখনই হবে, যখন নির্দলীয় সরকার মেনে নেওয়া হবে। দাবি মানার পর নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের মডেল বা রূপরেখা কী হবে, সেটি নিয়ে সংলাপ হতে পারে। এ ছাড়া সংলাপ করে কোনো লাভ নেই। তবে ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিনে ব্যাপক সহিংসতায় এক পুলিশ সদস্যসহ দুই জনের মৃত্যুর পর বিএনপি মহাসচিবসহ অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আর উদ্ভূত এই পরিস্থিতির পর নির্বাচন নিয়ে সংলাপ বা সমঝোতার পরিবেশ তৈরির আর কোন সুযোগ আছে বলে মনে করেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন। তিনি বলেন, ‘২৮শে অক্টোবরে যে সহিংসতা হলো সেই বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ যা বলছে তাতে আসলে সমঝোতার চিন্তা করারই আর কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি যাই হোক বিএনপির জন্য আওয়ামী লীগের সংলাপের দরজা খোলা নেই-এটিই এখন বাস্তবতা।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, দল দুটির এমন অনড় অবস্থানের কারণে সমঝোতার সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিলো না। তিনি বলেন, ‘তারা কেউই তাদের জায়গা থেকে কখনো একটুও সরেননি। এ অবস্থায় সংলাপ হওয়ার কথাও না। আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপ করার জন্য বিএনপিকে পরামর্শ দিয়েছিলো কিন্তু বিএনপি এই নির্বাচন কমিশনকেই মানছে না ‘ এমন পরিস্থিতিতে বিএনপি সফল হোক

আর না হোক কিংবা তাদের কর্মসূচি মানুষ গ্রহণ করুক আর না করুক-বিদ্যমান বাস্তবতায় সমঝোতার কোন পরিস্থিতিই অবশিষ্ট নেই বলেই মনে করেন তিনি।

তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করলেন হাসিনা-মোদি

ভারতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করা হয়। গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নয়াদিল্লি থেকে যুক্ত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রকল্প তিনটি হলো—আখাউড়া- আগরতলা আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ, খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিট।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘উন্নয়ন প্রকল্পগুলো উভয় দেশের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এছাড়া আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। এজন্য আমি নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত বছরগুলোতে আমরা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে আমাদের অর্জন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ভারতের জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।’

বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ মনে করিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালে ছিল ২৫.১ শতাংশ। ২০২২ সালে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছে আওয়ামী লীগ সরকার। মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালে ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে ২৭৬৫

মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।’

যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘এটা আনন্দের বিষয় যে আমরা আবারও ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার সাফল্য উদযাপন করতে সংযুক্ত হয়েছি। আমাদের সম্পর্ক ক্রমাগত নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। গত ৯ বছরে আমরা একসঙ্গে যে কাজ করেছি, তা আগের কয়েক দশকেও করা হয়নি।’

তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এটি কয়েক দশক ধরে ঝুঁলে ছিল। আমরা সমুদ্রসীমার বিরোধও সমাধান করেছি। গত ৯ বছরে ৩টি নতুন বাস পরিষেবা চালুর মাধ্যমে ঢাকা, শিলং, আগরতলা, গুয়াহাটি এবং কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘গত ৯ বছরে ৩টি নতুন ট্রেন পরিষেবাও শুরু হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে পার্সেল এবং কন্টেইনার ট্রেনগুলোও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চলছে, গঙ্গা বিলাস নামে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরী চালু করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটনও চাঙ্গা করা হয়েছে। গত ৯ বছরে আমাদের (বাংলাদেশ ও ভারতের) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তিনগুণ বেড়েছে।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত।’ তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে।’ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে এবং থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

আখাউড়া-আগরতলা আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ প্রকল্পটি ভারত সরকারের ৩৯২ কোটি ৫২ লাখ টাকার অনুদান সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। রেলসংযোগের দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক ২৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে ৬ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ রেললাইন এবং ত্রিপুরায় ৫ দশমিক ৪৬ কিলোমিটার।

খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন প্রকল্পটি ভারত সরকারের ছাড়ের লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় ৩৮৮ দশমিক ৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোংলা বন্দর ও খুলনার বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ

রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর মোংলা ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় ঋণসহায়তার আওতায় বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের রামপালে অবস্থিত একটি ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট (২x৬৬০) সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এমএসটিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রথম ইউনিটটি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে উদ্বোধন করেন এবং ইউনিট-২ চলতি বছরের ১ নভেম্বর উদ্বোধন করবেন।

অবরোধে দ্বিতীয় দিনে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল বেড়েছে

তিন দিনের অবরোধ ডেকে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় তালাবদ্ধ করে রেখেছে বিএনপি। রাজধানীর কোথাও অবরোধের সমর্থনে মাঠে নামেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে যানবাহন চলাচল। বিভিন্ন মোড়ে তৈরি হয়েছে যানজটও। ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক। নগরবাসীর নিরাপত্তার সড়কে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান।

অতীতে বিএনপির কার্যালয় অবরুদ্ধ কিংবা পুলিশের দখলে থাকলেও দলটির কার্যালয়ে অবস্থান করতে দেখা যেতো দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে। কিন্ত চলমান অবরোধ কর্মসূচিতে বিএনপির এই নেতাকেও কার্যালয়ের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর বাংলামোটর, শাহবাগ, সচিবালয়, পল্টন, মতিঝিল, কমলাপুর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্বাভাবিক দিনের তুলনায় সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা অনেক কম। তবে এসব এলাকার কোথাও অবরোধের সমর্থনে বিএনপি জামায়াতের কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। কোথাও চোখে পড়েনি মিছিল, শোনা যায়নি কোনো স্লোগান। একই

সময়ে সরকারি দলের কোনো নেতাকর্মীকেও মাঠে দেখা যায়নি।

এসব এলাকায় গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা প্রথম দিনের চেয়ে বেড়েছে। রিকশা, ভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মোটরসাইকেলের উপস্থিতিও বেশি। এই কারণে অবরোধের টানা দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন মোড়ে যানজট তৈরি হয়েছে।

এদিকে সময় মতো রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন। প্রতিটি ট্রেনেই যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। সাইফুল ইসলাম নামের এক যাত্রী জানান, জরুরি কাজে তাকে রাজশাহীতে যেতে হচ্ছে। একারণে স্টেশনে এসেছেন। কাউন্টারে ভিড়ের কারণে টিকিট কাটতে তাকে ঘণ্টা খানিক লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

বিএনপি ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে রবিবার হরতাল ঘোষণা করে। এরপর মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথে সর্বাত্মক অবরোধের ঘোষণা দেয়। একই কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীও। তাদের সঙ্গে আছে সমমনা দলগুলোও।

২৭ ঘণ্টায় আগুন সন্ত্রাসে পুড়েছে ১৪টি যানবাহন

বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচিতে ২৭ ঘণ্টায় সারাদেশে আগুন সন্ত্রাসে পুড়েছে ১৪টি যানবাহন। এরমধ্যে রয়েছে-বাস, ভ্যান, ট্রাক, পিকআপ। এছাড়া পণ্যের শোরুম, পুলিশ বক্স ও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেল এ তথ্য জানিয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৬টা থেকে বুধবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা পর্যন্ত মোট ১৭টি আগুনের সংবাদ পাওয়া যায়। রাজধানীতে ৪টি, ঢাকা বিভাগে ৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টি, রাজশাহী বিভাগ ৩টি স্থানে আগুন দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ৯টি বাস, ২টি কাভার্ড ভ্যান, ২টি ট্রাক, ১টি পিকআপ, ২টি বাণিজ্যিক পণ্যের শোরুম, ১টি পুলিশ বক্স পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি আরও বলছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ৯টি আগুন সন্ত্রাস হয়েছে। রাজধানীর পোস্তাগোলা, খিলগাঁও, বারিধারা ৩টি যানবাহেনে আগুন দেওয়া হয়। এছাড়া সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও রাঙ্গুনিয়ায়, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জে যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। এতে ৬টি বাস, ১টি কাভার্ড ভ্যান এবং ২টি ট্রাক পুড়ে যায়।

বিএনপি ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে রবিবার হরতাল ঘোষণা করে। এরপর মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথে সর্বাত্মক অবরোধের ঘোষণা দেয়। একই কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীও। তাদের সঙ্গে আছে সমমনা দলগুলোও।

` অবরোধে তাগো কী মিলবে জানি না, আমগো পেটে লাথি’

বিএনপি জামায়াতসহ অন্যান্য দলগুলোর ডাকা তিনদিনের অবরোধ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অবরোধের কারণে রাজধানীর রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকলেও অফিসগামী যাত্রীরা ছিলো বিপাকে। আর সবচেয়ে বেশি দুর্দশার মুখে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ। দিনের রোজগার না হলে যাদের চলে না তারা বলছেন, এই অবরোধ তাদের কথা ভেবে ডাকা হয়নি, এতে খুব বেশি সমর্থন পাবে না বিএনপি।

রিকশাচালক রুবেল মিয়া বলেন, ‘আজকে ঘরে বাজার নিয়া যাইতে পারুম না। মাইসেনের মনে আতঙ্ক, বাহিরে বাহির হইতে চায় না। ২৫০ গ্রাম কইরা প্রত্যেকটা জিনিস কিনলেও ৪০০-৫০০ টাকার লাইগা যায়। ৫০ – একশো টাকা যাই আয় হইবো সেইটা নিজেরই বাহিরে খাওনে লাইগা যাইবো। বাসায় মানুষ গুলান মুখে কি দিমু সেই চিন্তায় টিকটাছি না। আমরা তো কোন পক্ষের না, আমরা চাই সব কিছু স্বাভাবিক চলুক। পেটে ভাত জুটুক।’ পাশে বসে থাকা আরেক রিকশাচালক বলে উঠেন, ‘অবরোধে তাগো কিসু মিলবে কিনা জানি না, আমগো পেটে লাথি।’

কাকরাইল এলাকায় কথা হয় শুভদিন ইসলাম নামে এক মার্কেটিং কর্মীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘সকাল থেকে একটা ভয় ছিলো কি হয় না হয়। বের

হবো কি না। কিন্তু আমার তো সেলসে কাজ কমিশনে বেতন। তাই একটু বেলা করেও হলেও বের হইছি। দেখলাম পরিস্থিতি ঠিক আছে, পুলিশ মোড়ে মোড়ে দাঁড়ানো। কিন্তু দোকানপাট তো এখনও বন্ধ।

বিজয় নগর মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষায় থাকা হৃদয় বলেন, ‘যেমনটা ভাবছিলাম, তেমন কিছুই দেখছি না। তবে রাস্তায় গাড়ি কম। এমনিতেই তো ঢাকায় গাড়ি পাওয়া কষ্টের। আর গাড়ি না থাকায় কষ্টটা আরও বেড়েছে। আধাঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ হেটে আসলা। একটা সমাধানে আসা উচিত মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, এরকম করে তো আমাদের ভোগান্তি, একটা ভয় নিয়ে চলাচল করা লাগে। বাসা বাহিরে বের হলে বাসার লোকেরা চিন্তায় থাকে। এইসব কিছুর সমাধান হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য আমরা কেন বিপদে পড়বো।

তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচি শুরু হলেও সকাল সকাল মাঠে নামেনি বিএনপি। সকাল থেকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। কাকরাইল, নাইটিঙ্গেল, ফকিরাপুল কিংবা বিজয়নগরেও বিএনপি নেতাকর্মীদের কাউকে অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। এদিকে, বিএনপি-জামায়াতের অবরোধের নাশকতা ঠেকাতে রাজধানীর গুলিস্তানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

অবস্থান নেওয়া নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপি নাশকতার নামে নির্বাচন বানচাল করতে চায়। জনগণের জানমালের ক্ষতি করতে চায়। তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। সতর্ক পাহারায় আছি।

সাংবাদিক লাঞ্ছিত করলে সেই দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে

অ্যাটকো

যে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের হাতে সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হবেন, সেই রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছে টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স, অ্যাটকো। মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) অ্যাটকোর পরিচালক মণ্ডলীর এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনটি।

গত ২৮ অক্টোবর শনিবার ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মীরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব পালনকারী সাংবাদিকদের উপর হামলা চালায়। তারা গণমাধ্যমের যানবাহনও ভাংচুর করে। অ্যাটকো-র পক্ষ থেকে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ, ও প্রতিবাদ জানানো হয়। যারা এইসব ঘটনার জন্য দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়। এই সন্ত্রাসী ঘটনায় সকল নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে অ্যাটকো।

অ্যাটকো-র সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে যে দলের নেতা- কর্মীদের হাতে সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত ও বাধাগ্রস্ত হবেন এবং গণমাধ্যমের যানবাহন হামলার শিকার হবে সেই দলের বিরুদ্ধে অ্যাটকো অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। ওই সভায় গত ২৮শে অক্টোবরের রাজনৈতিক কর্মসূচি চলার সময় প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনের ওপর হামলা, কর্তব্যরত একজন পুলিশ সদস্যকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা, এবং সাধারণ যানবাহনে অগ্নিসংযোগের সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতা বন্ধ করে একটি অংশগ্রহণমূলক, অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলসহ সকল রাজনৈতিক দলকে দেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে কাজ করার জন্য অ্যাটকো-র সভা থেকে আহ্বান জানানো হয়।

রেমিটেন্স বাড়ছে: প্রতিদিন আসছে ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার

দেশের অর্থনীতির অন্যতম সূচক বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স আবারও বাড়ছে। গত সেপ্টেম্বরে বড় ধসের পর অক্টোবর মাসও শুরু হয়েছিল সেই পতনের ধারায়। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

গত ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তা থেকে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ২৭ দিনে প্রবাসীরা ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন। পরিমাণটি গত সেপ্টেম্বর মাসের পুরো সময়ের চেয়েও ২৩.৫৯% বেশি। সেই সময় ১.৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিলো। আর ২০২২ সালের অক্টোবরের পুরো মাসের চেয়ে ৮.১১ শতাংশ বেশি। তখন ১.৫২ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

অক্টোবর মাসের প্রথম ২৭ দিনে প্রতিদিনের গড় হিসাবে রেমিটেন্স এসেছে ৬ কোটি ১১ লাখ ডলার। একই হারে মাসের বাকি দিনগুলোতে ডলার আসলে অক্টোবর মাসজুড়ে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক ১.৯০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিদিনের এই গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৪ লাখ ডলার।
২০২০ সালের প্রথম দিকে পৃথিবীজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়ে ভৌগোলিক অর্থনীতি। সেই বছরে এপ্রিলেও ১.০৯ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এর পর থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সরকারের বিদ্যমান ২.৫% প্রণোদনার বাইরে গত ২২ অক্টোবর থেকে আরও ২.৫% প্রণোদনা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। অর্থাৎ কোনো প্রবাসী ১০০ টাকা দেশে পাঠালে তার সঙ্গে ২.৫০ টাকা যোগ করে দেশের প্রাপককে ১০২ টাকা ৫০ পয়সা দেওয়া হচ্ছিলো। গত ২২ অক্টোবর থেকে ১০২ টাকা ৫০ পয়সার সঙ্গে আরও ২.৫০ টাকা অর্থাৎ মোট ১০৫ টাকা পাবেন।

এই হিসাবে ১ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবাসীরা ১৯ হাজার ৫০ কোটি টাকা রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে প্রতিদিন ৭০৫

কোটি টাকা দেশে এসেছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস অর্থাৎ গত আগস্টে ১.৬ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর গত জুলাইয়ে ১.৯৭ বিলিয়ন ডলার দেশে এসেছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, ব্যাংকগুলোর ২.৫% বাড়তি প্রণোদনায় চলমান অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় বাড়ছে। সেই সাথে হুন্ডি বন্ধ করা গেলে রেমিটেন্স আরও বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি।

হরতাল-অবরোধে দেশের অর্থনীতি সংকটে পড়ার শঙ্কা

ফের হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়ায়ের কারণে দেশে অর্থনীতিতে সংকট আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষক–অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, দুই বছরের করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটতে না কাটতেই পৌনে দুই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এমনিতেই সংকটে আছে দেশের অর্থনীতি। ফের রাজনীতির মাঠ সহিংস হয়ে উঠলে দেশে অর্থনীতিতে সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে।

দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন, “বেশ ভালোই চলছিল। বেশ কিছুদিন হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও ছিল না। আবার শুরু হয়েছে অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এ সব ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি। আর এতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।’

তিনি বলেন, “রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভরশীল। বর্তমানে অর্থনীতি কঠিন সময় পার করছে। ডলার সংকটের কারণে এলসি করা যাচ্ছে না। কাঁচামালের অভাবে অনেক কারখানা পুরোপুরি উৎপাদন করতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে সংঘাতের রাজনীতি অর্থনীতিতে সংকট আরও ঘনীভূত হবে।” রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি নেওয়ার আহ্বান জানান এই ব্যবসায়ী নেতা।

মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির(এমসিসিআই) সভাপতি সায়ফুল ইসলাম বলেন, ‘যার যার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার ফলে করোনা মহামারীকে বাংলাদেশ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতিসহ নানান চ্যালেঞ্জ এসেছে অর্থনীতিতে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আবার রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচির ফলে অস্থিরতা দেখা দিলে অর্থনীতিতে তা আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।’

তিনি বলেন, “গত কয়েক বছরে দেশের অবকাঠামোখাতে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এখন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ নিয়ে নতুন করে ভাবছেন। সবাই ভাবছেন, বাংলাদেশ আগামীতে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হবে। স্থানীয় উদ্যোক্তারা অপেক্ষা করছেন একটি সুন্দর নির্বাচনের জন্য। এরকম সময়ে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা কাম্য নয়।”

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, “বৈশ্বিক পরিস্থিতি ভালো নয়। ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা কমছে। এরমধ্যে দেশের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি হলে রপ্তানিমুখী শিল্প খুবই সংকটে পড়বে। এরকম সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি। অস্থিরতা হলে ক্রেতারা বিকল্প খুঁজবেন। অর্থনীতিতে চাপ আরও বাড়বে।”

তিনি বলেন, “অর্থনীতি এমনিতেই খারাপের দিকে রয়েছে। রিজার্ভের পতন ঠেকছে না। আছে ডলার–সংকট। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও শেষ হচ্ছে না। ওই যুদ্ধের খারাপ ফল আমরা এখনো ভোগ করছি। নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সহিংসতা, যা আমাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।” তবে রাজনৈতিক পক্ষগুলো শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে বলেও আশাবাদী ফারুক হাসান।

বস্ত্রশিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, “দেশের বস্ত্র খাতসহ অন্যান্য শিল্প গভীর সংকটে আছে। প্রয়োজনীয় ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম সময়ে কোনো ধরনের অচলাবস্থা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি মারা যাবে।”

“ব্যবসায়ীরা অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু নির্বাচন চান। রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি নেবে, সেটাতে ব্যবসায়ীদের সমর্থন রয়েছে। তবে কোনো ধরনের অস্থিরতা, সহিংসতা হলে সেটা সামগ্রিক ব্যবসা

বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে,” যোগ করেন তিনি।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, “এটা বাংলাদেশের ব্যর্থতা; বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের। নির্বাচন এলেই এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, যার খেসারত দিতে হয় পুরো দেশকে। এবারও সংঘাত দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এই সংঘাত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।”

“সংঘাত চরম আকার নিলে তার অর্থনৈতিক প্রভাব হবে ব্যাপক। কারণ এবার অন্যান্য সময়ের তুলনায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ দুর্বল, বৈশ্বিক অবস্থাও পক্ষে নেই,” বলেন তিনি।

আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, “যেকোনোভাবে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে, সেটা রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই হতে হবে। নতুবা রাজনৈতিক দল, দেশ সবাই হারবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থনীতি আর সাধারণ মানুষ।”

তিনি আরও বলেন, “অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনীতি ঠিক না থাকলে কিছুই ঠিক থাকবে না। নিরাপত্তা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যাচ্ছে। যখন নিরাপত্তা থাকবে না, তখন বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবেন না।”

সহিংসতা পরিহার করে শান্তির ধর্ম ইসলামের পথে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা পরিহার করে সবাইকে শান্তির ধর্ম ইসলামের পথে দিকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতা পছন্দ করে না ইসলাম। নিরীহ মানুষকে যেন হত্যা না করা হয়।

আজ সোমবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-

চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে জাতীয় ইমাম সম্মেলনে এ আহবান জানান তিনি। এসময় দেশের তরুণ প্রজন্ম যেন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকে সম্পৃক্ত না হয়, সেদিকে ইমামদের দৃষ্টি রাখতে পরামর্শ দেন। ‘৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন এবং জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ-২০২৩’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না, সেটা আমরা বিশ্বাস করি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস যেন না হয়। তৃণমূল পর্যায়ে যেন শান্তি থাকে, সেটাই চাই। আমরা শান্তি চাই। অশান্তি বা যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা জানি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সহনশীল ধর্ম। এটা আমাদের নবী শিখিয়েছেন। তার বিদায় হজের বাণী আমরা অনুসরণ করি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকে সম্পৃক্ত না হয়, আপনারা (ইমাম) সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।’

সরকার প্রধান বলেন, ‘এই বাংলাদেশে অন্যান্য ধর্মের লোকও আছে। তারাও যেন নিজ নিজ ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারে। কেউ যদি অন্যায় করে, আল্লাহ বিচার করবেন। আমরা বলতে পারি না, কে মুসলমান, কে মুসলমান না।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আপনাদের দোয়া চাই। সারা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ চলছে ফিলিস্তিনে তাদের ওপর যে আক্রমণ, ছোট্ট শিশুদের যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে আমরা আর তা চাই না। ফিলিস্তিনে বাংলাদেশ থেকে সহায়তা পাঠিয়েছি। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র প্রধানদের আমি অনুরোধ করেছি যুদ্ধ বন্ধের পদক্ষেপ নিতে।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা চাই আমাদের হাজিরা যেন কষ্ট না পায়। হজের ইমিগ্রেশন সহজ করতে ব্যবস্থা নিয়েছি। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি দিয়েছি। ৩৫ হাজার মসজিদে পাঠাগার করে দিয়েছি। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছি। ওলামারা বিপদে পড়লে সহযোগিতা নিতে পারে। যাকাত তহবিল প্রণয়ন আইন করেছি।

এর আগে ষষ্ঠ পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের মসজিদ-ই-নববীর ইমাম শায়খ ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল বুয়াইজান উপস্থিত ছিলেন।